দৈনিক
ইত্তেফাক

22 NOV 2017

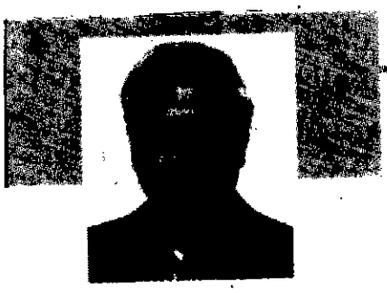

ড. শরীফ এনামুল কবির

উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন

আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মানের প্রশ্নটি দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। সরকার উচ্চশিক্ষা প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এখন সময় এসেছে এর গুণগত মানে মনোযোগ দেওয়ার। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষা-উপকরণ, গবেষণাগার, লাইব্রেরি, খেলার মাঠ প্রভৃতি বিষয় আবশ্যিক করা হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বশর্ত হিসেবে। হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই এসব নিয়মের তোয়াক্কা করছে না

ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো শিক্ষা। উপাদানের স্বল্পতার কারণে প্রাচীনকালে বাংলায় কোন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল—তার বর্ণনা দেওয়া, এমনকি সে সম্পর্কে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা খুবই কঠিন। তবে প্রাপ্ততথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা যায় অবশ্যই। বৈদিক যুগে আর্যরা প্রাচীন বাংলার জনগণকে দস্যু ও ম্লেচ্ছ বলে মনে করত। কিন্তু কালের স্রোতধারায় আর্যভাষা ও সংস্কৃতিই (সম্ভবত মৌর্য আমল থেকে) বাংলায় প্রবেশ করে।

সম্ভবত খ্রিস্টীয় ছয় শতকের পূর্বে বাংলার পণ্ডিতসমাজ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেননি। তবে চেষ্টাটা বোধ হয় কয়েক শতক আগেই শুরু হয়েছিল ও বৌদ্ধ সংঘারাম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রগুলো ছোট-বড় শিক্ষায়তন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানসৃজন ও বিতরণ; সেই সঙ্গে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে গত কয়েক বছরে দেশে গড়ে উঠেছে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলেও মানের বিষয়টি রয়েছে অলক্ষ্যেই।

সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে দেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ে। অ্যাপ্রোচ ফর বেটার এডুকেশন রেজাল্টস (এসএবিইআর) কান্ট্রি রিপোর্ট ২০১৭। প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাংক। প্রতিবেদনে ছয়টি ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো হলো—উচ্চশিক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন, কার্যদক্ষতার উন্নয়নে অর্থায়ন, স্বাধীন মান নিয়ন্ত্রণ ও দেশের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা। এর প্রত্যেকটিই উচ্চশিক্ষার মানের ওপর প্রভাব ফেলে।

এই প্রতিবেদনের তথ্যমতে, নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক মান অনুসরণের চেষ্টা করেছে। তবে সাফল্য নেই বাকি সব ক্ষেত্রগুলোতে। যদিও কোনো লক্ষ্যেই সন্তোষজনক মানের কাছাকাছিও নেই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজগুলো। তার পরও দ্রুত বাড়ছে এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে না পারলে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত দুর্বলই থেকে যাবে, যা টেকসই উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মানের প্রশ্নটি দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। সরকার উচ্চশিক্ষা প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এখন সময় এসেছে এর গুণগত মানে মনোযোগ দেওয়ার। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষা-উপকরণ, গবেষণাগার, লাইব্রেরি, খেলার মাঠ প্রভৃতি বিষয় আবশ্যিক করা হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বশর্ত হিসেবে। হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই এসব নিয়মের তোয়াক্কা করছে না। ভাড়া করা ছোট্টবাসা, ঘিঞ্জি পরিবেশে যত্রতত্র গড়ে উঠছে বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলোতে টিউশন ফি, সেশন চার্জ, ডোনেশনসহ অন্যান্য চার্জ ধরা হয় স্বাভাবিকতার কয়েকগুণ বেশি। গুণগত মানের পরিবর্তে নির্ধারিত সময় শেষে একটি সার্টিফিকেট তুলে দেওয়াই এসব প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। অবশ্য বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে 'মালিক' শব্দটি ব্যবহার করে মূলত বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যেখানে লাভ-লোকসানের ব্যাপার থাকে। ওয়েবসাইট হালনাগাদ না থাকা এবং উপযুক্ত বিধি ও নীতিমালা না থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানে হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ পর্যায়ে বেশিরভাগ পদই খালি রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এসব পদ খালি থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও অর্থ কমিটির মতো বাধ্যতামূলক সভা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে ব্যাহত হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-কার্যক্রম। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল বা অর্থ কমিটির সভা হয় না। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বা ইউজিসিকে না জানিয়েই নতুন কোর্স চালু, বিভাগ খোলা, শিক্ষার্থী ভর্তি প্রায় নিয়মিত ঘটনা হয়ে গেছে। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস রয়েছে বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের। সনদ বাণিজ্যের অভিযোগও আছে কয়েকটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্যমতে, ২০১০ সালে দেশে স্নাতক-স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মিলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ১ হাজার ৫৭২টি। ২০১৬ সাল শেষে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৯৫৪। অর্থাৎ ছয় বছরে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে ২৪ শতাংশ। এর বাইরে রয়েছে পলিটেকনিক এবং অন্যান্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেগুলোতে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা সনদ দেওয়া হয়। ২০১৫ সালে এ ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও বেশি। এসব প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগই গড়ে উঠেছে বেসরকারি উদ্যোগে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান বিশ্লেষণে চারটি মানকে ভিত্তি ধরেছে বিশ্বব্যাংক। ল্যাটেন্ট, ইমার্জিং, এস্টাবলিশড ও অ্যাডভান্সড'র মাধ্যমে এগুলোকে প্রকাশ করা হয়েছে। যেসব লক্ষ্য সামান্য গুরুত্ব পায় তাকে ল্যাটেন্ট, কিছু কিছু ভালো উদ্যোগ থাকলে তাকে ইমার্জিং, পদ্ধতিগত ভালো চর্চা হলে সেক্ষেত্রে এস্টাবলিশড ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে পরিচালিত হলে তাকে অ্যাডভান্সড হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের পর যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে, তা হলো শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ। উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের পথে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান আন্তর্জাতিক মানের হলেও কলেজগুলো অনগ্রসর অবস্থানে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক্ষেত্রে ইমার্জিং স্কোর পেয়েছে। নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সামগ্রিক স্কোর এস্টাবলিশড। সুশাসনের বিবেচনায়ও কলেজগুলো পিছিয়ে রয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এটি প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান ইমার্জিং। অর্থায়নের বিবেচনায় দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সামগ্রিক স্কোর ইমার্জিং। শিক্ষার মান নিশ্চিতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সামগ্রিক স্কোর ইমার্জিং হলেও কলেজগুলোর স্কোর ল্যাটেন্ট। অর্থাৎ কলেজগুলোতে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়টি মনোযোগের বাইরে রয়ে গেছে।

সারাদেশের বেশিরভাগ সরকারি কলেজের অবস্থাই সন্তোষজনক নয়। পাবনার ঈশ্বরদী সরকারি কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা সাড়ে ছয় হাজার। এর বিপরীতে শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৪৪ জন। শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা ২০। এগুলোর অর্ধেকের ধারণক্ষমতা ৩০ জনের কম। এর মধ্যে কয়েকটি ব্যবহৃত হচ্ছে বিভাগের অফিস, সেমিনার বা গবেষণাগার হিসেবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস হলে বসে থাকতে হয় ডিগ্রি (পাস কোর্স) ও স্নাতক সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের। এ কারণে এ দুই শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কলেজে নিয়মিত আসেন না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমস্যা বলতে যা বোঝায়, তার সবই আছে ঈশ্বরদী সরকারি কলেজে। ভাঙাচোরা একটি লাইব্রেরি থাকলেও নেই লাইব্রেরিয়ান। শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসন ও পরিবহনের ব্যবস্থাও নেই। খেলার মাঠ থাকলেও অভাব সরঞ্জামের। সমস্যার সবগুলো সূচক নিয়েই চলছে ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটি।

পর্যাপ্ত নজরদারির অভাবে কোনো ধরনের নিয়মনীতি অনুসরণ না করেই পরিচালিত হচ্ছে নামে-বেনামে গড়ে ওঠা বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়। তার পরও বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৯৫টি। এর মধ্যে ১৯৯২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দুই দশকে অনুমোদন পায় ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ ২০১২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত পাঁচ বছরের মধ্যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৪৩টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্তমানে শহর এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে কিন্ডারগার্টেন, ক্যাডেট স্কুল এবং মাদ্রাসা। শিক্ষার মানোন্নয়ন নয়, বরং ব্যবসাই মূল লক্ষ্য এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের। ছোট পরিসরে গাদাগাদি করে বসিয়ে পাঠদান, অদক্ষ ও তুলনামূলক বিবেচনায় স্বল্প শিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা পাঠদান, সরকারের পাঠ্যবইয়ের তুলনায় নিজেদের বইকে প্রাধান্য দেওয়া এবং অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে না ধরা, অসহনীয় ভর্তি ফি আদায়, অতিরিক্ত মাসিক বেতন, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার নামে মাসে মাসে পরীক্ষার ফি আদায়, শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর আগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন না করার অভিযোগও রয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। এমনকি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিও প্রদর্শন করা হচ্ছে না ব্যক্তি পর্যায়ের এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। দেশব্যাপী সরকারি-বেসরকারি স্কুলগুলোয় টিউশন-ফি, সেশন চার্জ ও ভর্তি-ফি আদায় নিয়ে নৈরাজ্য চলছে। প্রতিষ্ঠানগুলো ইচ্ছেমতো ফি আদায় করছে। এ নিয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকলেও তা কেউই মানছে না। কিন্ডারগার্টেন স্কুলসমূহের জন্য কোনো একক বা সাধারণ পাঠ্যক্রম নেই। নেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোনো দিক-নির্দেশনাও।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর একটি খসড়াও ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন সম্ভব হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে র‍্যাংকিংয়ের আওতায় আনা যাবে। এতে শীর্ষে থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। সারা বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তখন তুলনা করা যাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। এ কমিশন গঠন করতে পারলে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যথেচ্ছ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, উচ্চশিক্ষার চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নীতি নির্ধারণ সম্ভব হবে।

● লেখক : সাবেক সদস্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়